একক ১ ❑ ভেজাল ও নকল ঃ রাজশেখর বসু

১.০ প্রবন্ধ—'ভেজাল ও নকল'—রাজশেখর বসু

১.২ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

১.৩ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

১.৪ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

১.০ প্রবন্ধ—'ভেজাল ও নকল'—রাজশেখর বসু

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোন দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা, একেবারে খাঁটী দুধ কি দরে দিতে পার?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বারবার খাঁটী দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?

—তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরীব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যতপার বাড়াতে পার কিন্তু জল একদম দিতে পারব না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?

—তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের হলে আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটী দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

—অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে, খাঁটী কোথায়, মোষের দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরীব মানুষ, এ সব খরচ যোগাতে হবে তো!

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব এইসব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যে আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাবু, বঢ়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েছি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম ভেজাল কতটা দিয়েছ?

—বনস্পতি? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী সেরে আধ পোয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ?

—সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেড়ে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন?

—দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘি এর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটী ভঁয়সা ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁজ। চীনাবাদাম তিল তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও তাতে থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথর কুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুল-বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হত? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেধরা শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ, প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুখনো মটর সবুজ রঙে ছুবিয়ে বস্তাবন্দী করা হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেন খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের রং বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনিন এমেটিন আড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলছে।

ভেজাল ও নকল এ দেশে নুতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালো-বাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য। কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তারা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিষ বেচার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অন্য জিনিস খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পরে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করা হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কোন এক ল্যাবরেটারিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইণ্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য ফল বা প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাঙ থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরি সেইরকম। সরকার যে বস্তুর কথা বলেছেন তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাবুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

১.২ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ রাজশেখর বসু (১৬.৩.১৮৮০-২৭.৪.১৯৬০)

বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম হিসেবে খ্যাত রাজশেখর বসুর বাবা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার এবং দার্শনিক পণ্ডিত। নাম চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখর বসুর ছোটবেলাও কেটেছে দ্বারভাঙ্গায়, সেখানকার রাজস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স ও পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করে কলকাতায় চলে আসেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তখনো এম.এস.সি চালু না হওয়ায় রসায়ন নিয়ে এম.এ. পাস করেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। এরপর বি. এল. পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যখন গঠিত হয়, তখন তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হলেও পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন। একদিকে গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসা পরিচালনা—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। রসায়ন ও শরীরবিদ্যার মধ্যে যোগ স্থাপন করে তিনি এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি রসরচনার জন্যই মূলতঃ বিখ্যাত। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিত্য জীবন শুরু হলেও 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থ বাংলার রসিক মহলকে আলোড়িত করেছিল। রসরচনা ছাড়াও ও 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের কুটির শিল্প' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থাদিও বিখ্যাত। ১৯৩৭ খ্রীঃ তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত' প্রভৃতি। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

তবে বঙ্কিম থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের যে ধারা সেখানে রাজশেখর বসু তেমন আলোচিত নাম নয়, এর কারণ হয়তো প্রথমতঃ হাস্যরস রচয়িতার সত্তা তাঁর ক্ষেত্রে সবথেকে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্বল্প সংখ্যক প্রবন্ধ গ্রন্থ (কেবল তিনটি)। তবে প্রধান কারণ হল, প্রবন্ধে রস যুক্ত হলে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করে তা তাঁর প্রবন্ধে তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে প্রবন্ধ প্রয়োজনের কথায় পূর্ণ থাকলেও মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনের রস সৃষ্টি করা হয়, যা প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর বিষয়কেও পরম আস্বাদ্য করে তোলে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর এই শ্রেণির প্রবন্ধকার। তাই হয়তো রাজশেখরের নিজের স্বীকৃতিও শোনা যায় যে, যে অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যিক। সেই অর্থে তিনি সাহিত্যিক নন। প্রবন্ধের ধর্ম হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে। কিন্তু রাজশেখরের সমস্ত সাহিত্য-সর্জনা তাঁর বৃহত্তর কর্মসম্পাদনার নামান্তর। প্রবন্ধ রচনাও তাঁর একই কর্মের অভিমুখী এবং তা হচ্ছে, সমাজ ও দেশের মানুষের অজ্ঞানতা-কুসংস্কার, ভ্রান্তি দূর করা ও পরানুকরণ দ্বারা মানুষ যে বিজাতীয় আচার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অধোগামী করে, তার সংশোধন করা। ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রয়োজনের কথায় পূর্ণ। তবে ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন সচেতন শিল্পী, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখেছেন।

১.৩ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

গোয়ালা দুধে জল মেশায়। প্রাবন্ধিকের আপত্তিতে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে নিজের দোষ স্বীকার করে বলে যে, একটু অতিরিক্ত লাভের আশায় সে এই কাজ করে। প্রাবন্ধিকের উৎসাহে সে এই তথ্যও জানায় যে শুধু গোয়ালারাই নয়, নামকরা ডেয়ারি খাঁটি দুধ বলে যা বিক্রি করে, তা আসলে মোষের দুধে জল মেশানো দুধ। গোয়ালার

কথোপকথন শেষে প্রাবন্ধিক এই সত্যে পৌঁছন যে, ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী গোয়ালা সনাতন প্রথায় দুধে জল মেশাবেই। দাম বাড়িয়ে, আইন করে, খাদ্য তদারক (ইন্সপেক্টর) নিয়োগ করেও নির্জলা দুধ পাওয়া যাবে না। গুটিকয় ভাগ্যবান, যারা নিজের সামনে দুধ দুইয়ে নিতে পারেন তাদের কথা আলাদা।

বাড়ীর প্রাক্তন রান্নার ঠাকুর শিউরাম পাঁড়ে একদিন ঘি বিক্রি করতে এলে ঘি দেখে প্রাবন্ধিকের সন্দেহ হয় যে এতে ভেজাল আছে কারণ ঘি খুব সাদা, শক্ত ও একটু গন্ধযুক্ত। সন্দেহ প্রকাশ করলে শিউরাম অস্বীকার করলেও পরে বলে সে এবং গোয়ালা মিলিয়ে এক সেরে (কিলো) দেড় পোয়া (১ পোয়া = ২৫০ গ্রাম) মিশিয়েছে। প্রাবন্ধিকের সন্দেহ সেরে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এই রকম ভেজাল ঘি প্রাবন্ধিক নিজেই বানানোর প্রস্তাব দিলে লজ্জায় শিউচরণ আপত্তি জানায়।

দুধ-ঘি এর কালোবাজার না থাকায় ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। শিউরাম পাঁড়েদের বুদ্ধি কম বলে তাদের ঘি দেখলে ভেজাল বোঝা যায়, কিন্তু যারা বড় ঘি ব্যবসায়ী তারা নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) এর সঙ্গে কিছুটা হলুদ রং ও ঘি এর এসেন্স মিশিয়ে ঘি বলে বিক্রি করে। বাদাম, তিসি ইত্যাদি সস্তা তেল, আবার কখনো প্যারাফিন বা মিনারেল অয়েলের সঙ্গে ও এসেন্স দিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করা হয়। সংবাদপত্রে কখনো ভেজাল কারবারীদের নাম ছাপা হলেও তারা নেহাতই ছোট দোকানদার। বড় কারবারীদের নাম সংবাদপত্রে ছাপে না। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত ভেজাল কারবারীদের নাম ছাপতে পারলে ভেজাল কারবারীরা কিছুটা ভয় পেতে পারে। রেশনে যে বিদেশী ময়দা বিক্রি হয়, তাতেও ভেজাল আছে বলে প্রাবন্ধিকের সন্দেহ। রেশনের আটার ভুসি, চালের পাথরকুচি ইত্যাদি ভেজাল কোথায় মেশানা হয় তা সরকারী কর্তাদের অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু এসব বন্ধে তাদের দিক থেকে উদ্যোগ নেই। আটার কলে সোপ স্টোন বা তেঁতুল বিচি আটক করার খবর একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও এ নিয়ে পরে আর কিছু জানা যায় নি। খাদ্যে ভেজাল বন্ধে সরকারী উদ্যোগ জনগনকে জানানো উচিত।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের মধ্যেই ভেজাল দেখা যায়, অসময়ে শুকনো মটরকে যে সবুজ রঙে ছুপিয়ে টাটকা বলে বিক্রি করা হয়, মিষ্টিতে যে রং ময়রারা ব্যবহার করে তা বিষ কিনা কেউ ভাবে না। নির্বোধ খদ্দের সেই রং দেখেই আকৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যে খাদ্যে নির্দোষ রঙের বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করলে দন্ড হয়। এখানেও সরকারের উচিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা। চায়ের দোকানের চা পাতা থেকে শুরু করে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সবেতেই ভেজাল। তবে সবথেকে বেশী ভেজাল ওষুধে, কুইনিন, এমেটিন, আড্রেনালিন প্রভৃতি বিভিন্ন ওষুধ ও প্রসাধন দ্রব্যের পুরনো সিসি গৃহস্থ বাড়ী থেকে কিনে নিয়ে তাতে ভেজাল দিয়ে আসল বলে বিক্রি হয়। পাকিস্তানেও একই জিনিস চলছে। কিছু গৃহস্থ সচেতনভাবেই এই ব্যবসায় সাহায্য করে।

বহুদিনের ভেজাল ব্যবস্থার ফলে দেশীয় বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের এতই অনাস্থা জন্মেছে যে খাঁটি জিনিসের জন্য আমরা বিদেশী দোকানের দ্বারস্থ হই। স্বাধীনতার পরে সমস্ত দুষ্কর্ম আরো বেড়েছে। সরকারের সামর্থ নেই সম্পূর্ণ প্রতিকারের। অসচেতনতার ফলে জনগণও ঐক্যবদ্ধ নয়। সম্প্রতি কিছু মানুষ ট্রাম-বাস পুড়িয়ে, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করছে। কিন্তু তারা ভেজাল, কালোবাজার নিয়ে নির্বিকার। দেশব্যাপী অনাচার সাধারণ মানুষ নির্বিবাদে মেনে নিলেও কিছু সমাজহিতৈষীর উদ্যোগে তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে, যেমন সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি ঘটেছে। ভেজাল নিবারণেও কিছু নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষীর প্রয়োজন, যারা জনগনকে সচেতন করবেন ও বিশুদ্ধ জিনিস বিক্রির জন্য সমবায় ভাণ্ডার খুলবেন। তবেই বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা বহুদিনের অভ্যাস বদলাবে।

অভ্যস্ত খাবারের অভাব হলে, তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও আমাদের বিকল্প খাদ্যের খোঁজ করা উচিত। জনগন প্রাথমিকভাবে এই ধরনের খাবার খেতে অস্বীকৃত হবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। সরকারের উচিত লাল-আলু, টাপিওকা এ ধরণের খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করা। কিন্তু অত্যুক্তি করলে বিপরীত ফল হবে। বলা উচিত এগুলি চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এগুলিতে জীবনরক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও নেই।

সরকারি খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে, কোনো এক গবেষণাগারে ভুট্টা, টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটি সত্যের অপলাপ। একে নকল সোনার মত, নকল চাল বলা যেতে পারে;কারণ নীল, কর্পুর, মেন্থল প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গেলেও কৃত্রিম উপায়ে কোনো শস্য তৈরি করা এখনো বিজ্ঞানের অসাধ্য। যে নকল চাল তৈরি করা হচ্ছে তাতে প্রোটিনের মাত্রা বাড়াবার জন্য সম্ভবতঃ চীনা বাদামের গুড়ো মেশানো হচ্ছে। দেখতে চালের মত হলে হয়ত দরিদ্র মানুষ তা খাবে। কিন্তু এর গুণ আসল চালের মত হবে না। ফলে প্রচারের ব্যাপারে সরকারের সচেতন থাকা উচিত। 'সত্যমেব জয়তে' এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন না হয়।

১.৪ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

রাজশেখর বসুর 'ভেজাল ও নকল' প্রবন্ধটি, তাঁর যে তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে, তার মধ্যে 'বিচিন্তা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। এই প্রবন্ধটি প্রাবন্ধিক ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য চারটি। (এক) আমাদের প্রতিদিনের নানা রকম খাদ্যে নানা ভেজাল মেশানো হয়। যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। (দুই) এই খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী বেসরকারী দুই পক্ষেরই গাফিলতি আছে। (তিন) এই ভেজাল প্রতিরোধে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। (চার) ভেজাল যতদিন আটকানো না যাচ্ছে ততদিনের বিকল্প ব্যবস্থা।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে খাদ্যে ভেজালের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি দুধের উদাহরণ দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁর মতে দুধের নকল না থাকায় লাভ করার জন্য ব্যবসায়ীর দুধে ভেজাল হিসেবে জল মেশায়, যা দুধের খাঁটিত্ব হয়ত নষ্ট করে কিন্তু এতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কম। আগে ঘিতে ভেজাল হিসেবে চর্বি মেশানো হত। কিন্তু এখন বড় ব্যবসায়ীরা ঘি বলে যা বিক্রি করে তাতে ঘি থাকেই না। নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) এর মধ্যে হলুদ রং ও ঘি এর গন্ধ মিশিয়ে বিক্রি করে। সর্ষের তেলের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি যে কোনো সস্তা তেলের মধ্যে গন্ধ মিশিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করা হয়। কেউ কেউ আবার অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলের মধ্যে গন্ধ মিশিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করে। শুধু দুধ-ঘি-তেল নয়, ময়দা-আটা থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত সমস্ত কিছুতেই নানা মাত্রায় ভেজাল মেশানো হয়। রেশনের ময়দা বেলবার সময় রবারের মত টান হয়। আটায় প্রচুর পরিমাণে ভূসি থাকে গম-যব ছাড়া অন্য শস্যের বলেই মনে হয়। আটার কলে ভেজাল হিসেবে সোপ স্টোন বা তেঁতুল বিচিও পাওয়া গেছে। চালে ভেজাল হিসেবে পাথরকুচি মেশানো হয়। অসময়ে বাজারে যে সবুজ মটরশুঁটির দানা বিক্রি হয়, তা আসলে শুকনো মটর বস্তাবন্দী করে সবুজ রঙে ছুপানো। এতে যে রং মেশানো থাকে তা বিষ কিনা কেউ ভাবে না। মিষ্টিতেও নানারকম রং মেশানো হয়। চায়ের দোকানে অব্যবহৃত চায়ের সঙ্গে ব্যবহৃত চায়ের গুঁড়ো ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়। এলাচ-লবঙ্গ-দারচিনি থেকে কিছুটা আরক বের করে নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়। তবু সব থেকে বেশী খারাপ অবস্থা ওষুধের। জাল ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে।

প্রাবন্ধিকের দ্বিতীয় বক্তব্য ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী-বেসরকারী গাফিলতি। তিনি বলেছেন, মাঝে মাঝে কোনো কোনো ভেজাল ঘি তেল কারবারী দন্ড পেলেও বড় ব্যবসায়ীদের প্রায় কিছুই হয় না। যদি হয়ও শুধু ছোটো ব্যবসায়ীদের নামই খবরের কাগজে ছাপা হয়। বড় ব্যবসায়ীদের নয়। কারণ তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে জানে। চালে পাথরকুচি মেশানোর কথাও সরকারী কর্তা ব্যক্তিরা জানে। অনেক রেশন দোকানে আবার দু' রকম চালের বস্তা থাকে। এক রকম ভেজাল মেশানো যা বেশীরভাগ মানুষকে দেওয়া হয়, আরেক রকম ভালো, যা বাছা খদ্দেরের জন্য। ভেজাল আটক করা হলেও তাৎক্ষনিকভাবে এ খবর প্রচার করা হয়, ধারাবাহিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। খাবারে যে রং মেশানো হয়, তা মিউনিসিপ্যালিটির মার্কেট অধ্যক্ষদের সামনেই বিক্রি হয়। আর জাল ওষুধের কারবারে অনেক সময় সচেতন ভাবে অনেক গৃহস্থও যুক্ত থাকে।

প্রাবন্ধিক তাঁর তৃতীয় অংশের বক্তব্যে এই ভেজাল প্রতিরোধে কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে যে সব ভেজাল কারবারীদের ধরা হচ্ছে, তাদের সবার নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত প্রকাশ করা উচিত। এই ব্যবস্থা নিলে বদনাম আর খদ্দের হারাবার ভয়ে ভেজাল কারবারীরা কিছুটা শাসিত হতে পারে। মাঝে মাঝে যে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল ধরা হয়, সে সব ঘটনার অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারের তরফে জনগণের কাছে প্রকাশ করা উচিত। বিদেশে খাবারে ব্যবহার্য রঙের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে এখানেও সেই বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। যতদিন না সেই ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন খাবারে রঙের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। সাধারণ মানুষকেও রং ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত।

প্রাবন্ধিক মনে করেন না যে সমস্ত দায়িত্ব সরকারের পক্ষে একা নেওয়া সম্ভব। জনসাধারণেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন বামপন্থীদের 'বীরপুরুষ' বলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এরা শ্রমিকদের, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে ট্রাম-বাস পোড়ায়, কিন্তু এরা ভেজাল, নকল, কালো-বাজার সম্বন্ধে নির্বিকার। ফলে তাঁর মতে কালোবাজারী ঠেকাতে সমাজহিতৈষীদের উৎসাহ দরকার, যেভাবে সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ সাধন সম্ভব হয়েছে সমাজহিতৈষীদের উদ্যোগে তেমনি কিছু নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষীর প্রয়োজন, যারা ভেজাল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে যেমন অবহিত করবেন, তেমনি বিশুদ্ধ জিনিষ বেচবার জন্য সমবায় ভাণ্ডার খুলবেন। দাম বেশী নিলেও বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়ার আসায় মানুষ এখানে আসবে এবং এই প্রভাবে সমস্ত ব্যবসায়ীরাই তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

প্রবন্ধের শেষ অংশে যতদিন ভেজাল আটকানো না যাচ্ছে, ততদিন বিকল্প কি করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে যতদিন না ভেজালহীন খাবার পাওয়া যায়, ততদিন তুলনায় নিকৃষ্ট ও অনভ্যস্ত খাবারই খাওয়া উচিত। জনগণের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত করার জন্য একদিকে যারা ধনী ও জ্ঞানী তাদের কর্তব্য তাঁরা যাতে ও ধরণের খাবার খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেন, আর সরকারের উচিত অত্যুক্তি না করে বা মিথ্যা না বলে এ ধরনের খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করা। এ ধরনের খাবারের মধ্যে প্রাবন্ধিক লাল আলু, টাপিওকা প্রভৃতির নাম করেছেন। এ সব অনভ্যস্ত খাদ্যে চাল-আটার সমান পুষ্টি না থাকলেও এসব খাদ্যে জীবন রক্ষাও হয়, স্বাস্থ্যহানিও ঘটে না। কিন্তু সমস্যা হ'ল অত্যুক্তি আর মিথ্যা প্রচারের। যেমন একজন খাদ্যবিশারদ প্রচার করেছিলেন যে ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি হবে। সরকারের উচিত একদিকে এসব প্রচারে প্রশ্রয় না দেওয়া অন্যদিকে নিজেদের প্রচারেও অত্যুক্তি না

করা। সরকারী খবরেও প্রকাশিত হয়েছে যে ভুট্টা, টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ প্রচার অসত্য। রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হলেও শস্য তৈরি বিজ্ঞানের অসাধ্য। যে জিনিস তৈরি হচ্ছে তাকে নকল চাল বলা উচিত। নকল সোনা যেমন আসল সোনার মত দেখতে হওয়ায় অনেকে কেনে। তেমনি এ জিনিস চালের মত দেখতে হলে দরিদ্র মানুষ হয়ত কিনবে, কিন্তু এর পুষ্টি কখনো আসল চালের সমান হবে না। সরকারের উচিত প্রচারের ব্যাপারে যাতে কোনো অসতর্ক উক্তি না হয়, 'সত্যমেব জয়তে' রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকে রাষ্ট্রেরই মনে রাখা উচিত।

এই প্রবন্ধটি বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্গত বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু অত্যন্ত সহজ চলিত বাংলায় এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধের মত এটিও প্রয়োজনমূলক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কালোবাজারী--ভেজাল সমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল সেই প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত এই প্রবন্ধ। সমস্যার শুরু আগেই। স্বাধীনতার আগেই আওয়াজ উঠেছিল দেশ স্বাধীন হলে সমস্ত কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো হবে। কিন্তু দেখা গেল সমস্যা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সে কারণে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ। এ সমস্যা যে কত ভয়াবহ তা আমরা স্বাধীনতার চার দশক পরে প্রত্যক্ষ করেছি ভেজাল তেল খেয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। ফলে তিনি জাজ্বল্যমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছেন। তবে তৎকালীন বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ ঠিক নয়। সে সময়ে বামপন্থীদের আন্দোলনের একটি বড় বিষয়ই ছিল ভেজাল কালোবাজারী। আন্দোলনের ময়দানে, গানে, কবিতায়, নাটকে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে বামপন্থীদের এ বিষয়ে সরব হতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনাস্থার কারণে হয়তো বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর এ মূল্যায়ন। সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে এই ধরণের কার্যকরী প্রবন্ধ অন্নদাশঙ্কর রায়ও অনেক লিখেছেন। এসমস্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাবন্ধিকের যৌক্তিকতাবোধ ও নীতিরোধের শানিত তীক্ষ্ণতা। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকে স্মরণে রাখতে বলার নেপথ্যে কাজ করছে প্রবল দেশপ্রেমের বোধ। কল্যাণমূলক ও সত্যকামী রাষ্ট্রের মানবিক মুখ স্বাধীনোত্তর অনেক প্রাবন্ধিকের কলমেও ফুটে উঠেছিল পরবর্তীকালে। সামাজিক জীবনে সংস্কারমূলক চিন্তাচেতনার প্রকাশ রাজশেখর বসুর মতন বিজ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ, স্বাধীন ও স্বয়ম্ভরতার প্রচারকের লেখাতেও ঘটেছে। সমস্যা সমাধানের কোন নৈরাজ্যকামী আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ট্রাম-বাস পোড়ানোর আন্দোলনের ঝোঁক সম্পর্কে সচেতনভাবে সমালোচনা করেছেন। সর্বোপরি রাজশেখর বসুর রচনার মধ্যে একটা statesmanship ছিল যার প্রকাশ প্রবন্ধগুলির স্থিতধী ও শানিত প্রকাশভঙ্গী।